আমার স্কুল

সেলিনা হোসেন
রফিকুন নবী চিত্রিত

আমার স্কুল

সেলিনা হোসেন

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে:

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : রফিকুন্ নবী
তৃতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৮, মে ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৮, ফেব্রুয়ারি ২০০২
ISBN 984-465-297-9

মূল্য : চল্লিশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

তাসমিয়া

এক আকস্মিক
পরিচয়ের পর এই
বই তোমার জন্য

স্কুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব

যে স্কুলে আমার প্রথম লেখাপড়া শুরু হয় তার নাম লতিফপুর প্রাইমারি স্কুল।

কবে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম সেই তারিখ বা সাল আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে সময়টা ছিল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। সে সময়ে আমার বাবা বগুড়ার সেরিকালচার নার্সারিতে চাকরি করতেন। নার্সারিতে বড় বড় তুঁত বাগান ছিল। আর ছিল পলু পোকার ঘর। এইসব ঘরে পলু পোকা থেকে রেশমের গুটি তৈরি হতো। এই গুটিকে বলা হয় ককুন। ককুন থেকে রেশমের সুতো বের করে সিল্কের কাপড় তৈরি করা হতো। শুধু সিল্ক নয় গরদ, মটকা ইত্যাদি কাপড়ও তৈরি হতো। আমার বাবা এই অফিসের বড়বাবু ছিলেন। আমরা যেখানে থাকতাম সে গ্রামটির নাম ছিল গণ্ডগ্রাম। কিন্তু আমাদের বাড়িটি ছিল নার্সারির ভেতরে। আর নার্সারিটি ছিল বগুড়ার বড় রাস্তার ধারে। এখন এই রাস্তা দিয়েই ঢাকা থেকে বগুড়ায় আসতে হয়। তখন অবশ্য এই রাস্তা দিয়ে ঢাকা বগুড়ায় যাতায়াত করা যেতো না। ট্রেনে করে ঢাকায় আসতে হতো। গণ্ডগ্রাম নামটি আমার পছন্দের নাম ছিল না। কেমন বিদঘুটে লাগতো। ছোটবেলায় মনে হতো এটা কোনো গাঁয়ের নাম হলো? গাঁয়ের নাম হবে অন্যরকম সুন্দর। 'গণ্ডমূর্খ' শব্দটি জানতাম। বাড়িতে বা স্কুলে কাউকে বকা দেওয়ার সময় এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো। সে কারণে গণ্ডগ্রাম নামটা নিয়ে আমি খুব মন খারাপ করতাম। গ্রামের পাশেই একটি বিশাল বিল ছিল। বর্ষায় এই বিল পানিতে টইটুম্বুর থাকতো। চৈত-বোশেখ মাসে পানি শুকিয়ে গেলে কাদাপানিতে পোলো দিয়ে মাছ ধরতো সবাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে যখন অভিধান দেখতে শিখেছিলাম তখন আমি 'গণ্ডগ্রাম' বলে কোনো শব্দ আছে কি না দেখার চেষ্টা করি। আমার ধারণা ছিল এটি একটি নাম মাত্র। এই শব্দ অভিধানে থাকবে না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম 'গণ্ডগ্রাম' শব্দের একটি নয় দুটি অর্থ

অভিধানে আছে। প্রথম অর্থটি হলো জনবহুল বড় গ্রাম। দ্বিতীয় অর্থ হলো ক্ষুদ্রগ্রাম; পল্লীগ্রাম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অভিধানে শব্দটি পেয়ে আমি বেশ আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নিশ্চয় কোনো বড় পণ্ডিত এই গ্রামটির নাম রেখেছিলেন। পণ্ডিতের কথা ভাবতেই আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলাম। কয়েকদিন বান্ধবীদের সঙ্গে অভিধানের গল্প করেছিলাম। একই সঙ্গে এই গ্রামে থাকার আনন্দও পেয়ে বসেছিল আমাকে। এখন ওই গ্রামটির কথা ভেবে আমি বেশ আনন্দ পাই।

এই গ্রামটি বগুড়ার বিখ্যাত করতোয়া নদীর ধারে অবস্থিত ছিল। বিখ্যাত পুরাকীর্তি মহাস্থান গড়ের সভ্যতা কোনো এক সময়ে এই করতোয়া নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। মহাস্থান গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনো আমাদের সে কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই গণ্ডগ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে আমরা লতিফপুর প্রাইমারি স্কুলে যেতাম। আমরা বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে দলবেঁধে, হৈ-চৈ করতে করতে স্কুলে পৌঁছে যেতাম। আমাদের প্রত্যেকের বাবা সেরিকালচার নার্সারিতে চাকরি করতেন । সবার বাড়িই ছিল কাছাকাছি। এই দলে আমরা পিঠাপিঠি তিন ভাইবোনও ছিলাম। দলের সবার বয়স ছিল কাছাকাছি। তাই স্কুলে যাওয়ার পথটুকু ছিল আনন্দের। আমাদের জন্য সময়টা ছিল ভীষণ মজার।

আমাদের স্কুলে যাওয়ার পথ ছিল দুটো। একটি পুলিশ লাইনের ভেতর দিয়ে। অন্যটি পুলিশ লাইনের বাইরে দিয়ে। স্কুলের যাওয়ার পথে পুলিশ লাইনটি ছিল বাধার মতো। ভেতর দিয়ে গেলে আমরা অল্প সময়ে স্কুলে পৌঁছে যেতাম। বাইরের পথটি ছিল ঘুরপথ। আমাদের অনেকটা পথ হেঁটে স্কুলে পৌঁছাতে হতো। এই ঘুরপথে যেতে আমাদের মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হতো। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ লাইনটিকে তখন গালি দিতে দিতে যেতাম। মাঝে মাঝে আসা-যাওয়ার পথে পুলিশ লাইনের গেট বন্ধ করে রাখা হতো। তখন আমরা এর ভেতর দিয়ে যেতে পারতাম না। তখন আমাদের ভীষণ মন খারাপ হতো।

আসলে পুলিশ লাইনের ভেতর দিয়ে যেতে আমরা বেশ মজা পেতাম। তখন এটাকে আমাদের আর বাধা বলে মনে হতো না। কখনো আমরা পুলিশের পিটি করা দেখতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কী সুন্দর একসঙ্গে হাত উঠছে, নামছে—একসঙ্গে পা উঠছে, নামছে। আমাদেরকেও স্কুলে পিটি করতে হতো। কিন্তু খাকি হাফ-প্যান্ট পরা পুলিশের পিটির সৌন্দর্যই ছিল অন্যরকম। মাঝে মাঝে আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের বন্দুক ছোঁড়া প্র্যাকটিস করতে দেখতাম। দূরের চাঁদমারি টিলায় গুলির সিসা জমতো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের নাম জিগ্যেস করতো। কে কোন ক্লাসে পড়ি তা জানতে চাইতো। এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে আমরা স্কুলে ঠিকমতো পৌঁছানোর জন্য দৌড়াতে শুরু করতাম। দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছে যেতাম স্কুলে। ঠিক ঘণ্টা পড়ার আগে। বুকে হাঁফ ধরে যেতো। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতাম। তারপর অল্প সময়ে সব ঠিক হয়ে যেত। যেন ম্যাজিক। মনে হতো এক অদৃশ্য জাদুকর বুঝি আমাদের পিছে পিছে ঘোড়া নিয়ে ছুটছে। কখনও তুলে নিচ্ছে ঘোড়ার ওপরে, কখনও পক্ষিরাজে। এইসব ভাবনার মাঝে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়ার বেগে ছুটতাম। আমার ক্লান্তি ছিল না।

যেদিন পুলিশ লাইনে স্পোর্টস হতো আমরা দলবেঁধে দেখতে আসতাম। ওদের চাঁদমারি প্র্যাকটিসের দিন আমাদের জন্য ছিল সবচেয়ে মজার। সেদিন আমরা পুলিশ লাইনের বাইরে দিয়ে ঘুরপথে আসাটা বেশি পছন্দ করতাম। কারণ ঘুরপথেই পড়তো চাঁদমারি টিলাটা। আর আমরা টিলায় উঠে গুলি থেকে বেরিয়ে আসা সিসাগুলো খুঁজতাম মনের আনন্দে। এই সিসা হানিফের দোকানে দিলে হানিফ আমাদের লেবেনচুষ কিংবা মিষ্টি মুড়কি দিতো। আমরা সেইসব খেতে খেতে বাড়ি ফিরতাম।

কখনও হানিফের দোকানের পেছনের ফলসা গাছটার নিচে বসে গুটি-গুটি ফলসা কুড়াতাম। পেকে টসটসে হয়ে গেলে গাছ থেকে পড়ে যেত ফলগুলো। গাছের নিচে বিছিয়ে থাকতো। আমরা আলতো হাতে তুলে নিতাম। বই-স্লেট রেখে দিতাম গাছের গোড়ায়। পিঁপড়ের সারি উঠে যেতো গাছের কাণ্ড বেয়ে। আমরা ছড়া কাটতাম : 'লাল পিঁপড়ে করমচা/গাছের ডগায় উঠে যা। দুটো ফল ঝরিয়ে দিবি/গুড়-মিষ্টি খেয়ে নিবি।' ফল কুড়ানো শেষ হলে আমরা এই ছড়া কাটতে কাটতে গাছের চারদিকে ঘুরে বেড়াতাম। ফলসা গাছের শুকনো পাতা পায়ের নিচে মচমচ করতো। আর কখনো ঘাসের ভেতরে ডুবে যেতো পা। এভাবে স্কুল থেকে ফেরার আনন্দ আমাদের কাছে একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতো। আমার মনে হতো স্কুলে যাওয়া হয়েছিল বলেই এতো মজা পাওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে এসব কিছুর জন্য সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাও ছিল ভীষণ চ্যালেঞ্জিং।

সেই বয়সেই মনে হয়েছিল স্কুল মানে শুধু পড়াশোনা নয়, চারপাশের জগৎকে চিনে নেওয়ারও চেষ্টা করা। চারপাশে কতোকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেসব দু'চোখ ভরে দেখা। কখনও গাছ বলতো আমাকে দেখো, কখনো নদী, কখনো ধানক্ষেত বা বিল। ছোট্ট পাখি, বুনোফুল বুঝি আমাদের সঙ্গী ছিল। ভীষণ ছোট ঘাসফুল ছিঁড়ে নাকে লাগাতাম। বন্ধুদের বলতাম, দেখ কি সুন্দর নাকফুল পেয়েছি।

দেখি, দেখি, বলে ওরা ছুটে আসতো। কাছে এসে বলতো, ইস কি সুন্দর ফুল! কোথা থেকে পেলি? আমাদেরকেও দে।

আমি বলি, উঁহু, এই ফুল শুধুই আমার। আর কাউকে দেয়া যাবে না। তোরা অন্যটা খুঁজে নে।

তোর মতো পারবো না, তোর যা চোখ।

আমি দেবো না।

অন্যরা তখন অন্য ফুল খুঁজতে ছুটতো।

আর আমি বটের ডালে বসে থাকা ঘুঘুটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। ওটার খয়েরি পালকের ওপর সাদা ফোঁটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আর ঘু-ঘু ডাক শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে উঠতাম। ভাবতাম কত কিছু যেন পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছি। আমি আর এইসব হারানো মানিক ফিরে পাবো না।

নদীর ধারে দাঁড়ালে খেয়াঘাটটা ছিল আমার আশ্চর্যের বিষয়। পারাপার দেখতে খুব ভালো লাগতো। একদল যাচ্ছে, অন্যদল আসছে। আসা-

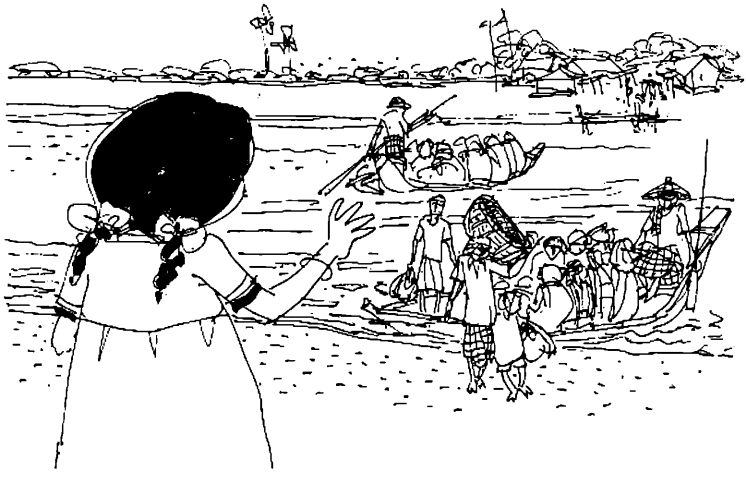

যাওয়া—আসা-যাওয়া। আমার ভেতরে আসা-যাওয়া শব্দ গুমরাতে থাকতো। আমি একদিন স্কুলের স্যারকে জিগ্যেস করেছিলাম, স্যার নদী মানে কি? স্যার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এমন প্রশ্ন কেন করলি? তুই নদী দেখিস নি? আমাদের বিখ্যাত করতোয়া নদী?

দেখেছি স্যার। অন্য ছেলেমেয়েরাও চেঁচিয়ে বলে, আমরাও দেখেছি স্যার।

তাহলে তো তোরা জেনেই গেছিস যে নদী দেখতে কেমন। নদী হলো একটি জলস্রোত। এই জলস্রোত পাহাড় কিংবা হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়। তারপর বিভিন্ন গ্রাম, শহর কিংবা পতিত জমির ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

আমি তখন মনে মনে আউড়াতাম, নদী হলো একটি জলস্রোত।

নদীর ধারে এসে বলতাম, জলস্রোত তোমার সঙ্গে আমাকে নাও। আমিও তোমার মতো নতুন নতুন জায়গা দেখতে চাই।

বই পড়ে যে সবকিছু শেখা যায় না স্কুলে থাকতেই আমি তা বুঝেছিলাম। বিশাল কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলতাম, তুমি কীভাবে এত বড় হয়েছে তা আমি দেখতে চাই।

স্কুলে যাওয়ার পথে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়া ছিল আমার বড় শিক্ষা। মাঝে মাঝে এইসব নিয়ে স্যারদের প্রশ্ন করতাম। স্যাররা কখনো উত্তর দিতেন, কখনো দিতেন না। বলতেন, বড় বেশি কৌতূহল মেয়েটার।

চুপ হয়ে যেতাম স্যারের কথা শুনে। কিন্তু মনের ভেতরের প্রশ্নগুলোকে তাড়াতে পারতাম না। কেবলই মনে হতো পাখি কীভাবে ওড়ে, মাছ কীভাবে

সাঁতার কাটে, অন্ধকারে পোকা ডাকে কেন–এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতাম না।

স্কুল থেকে ফেরার সময় মাঝে মাঝে বইখাতা গাছের নিচে রেখে পেয়ারা কিংবা জাম গাছে উঠে যেতাম। সবুজ পেয়ারার ভেতরটা দেখতাম লাল হয়ে আছে। কখনো জামগাছের ডালে বসে কালোজাম ছেঁড়ার ফাঁকে বড় লাল পিঁপড়ে কামড়ে দিতো শরীর। বিষাক্ত পিঁপড়ের কামড়ে ফুলে যেতো হাত কিংবা পা। কিন্তু সেটা এমন কিছু মনে হতো না। পাকা জামে জিভ লাল করার প্রতিযোগিতা তখন সামনে। পিঁপড়ের কামড়ে কি এসে যায়! প্রতিযোগিতাটাকেও আমি শেখার অংশ বলে মনে করতাম। প্রতিযোগিতা করে জয়ী হওয়াটাকে আমি ভীষণ গুরুত্ব দিতাম। এই প্রতিযোগিতা আমার ওই বয়সে আর কিইবা হতে পারতো। তাই প্রতিযোগিতার সামান্য বিষয়ও আমার মনোযোগ পেতো। বিদ্বেষ বা আক্রোশ নয়, চ্যালেঞ্জই ছিল প্রধান। তাই হুটোপুটি করে প্রতিযোগিতার শেষে বই-স্লেট বুকে জড়িয়ে অনায়াসে বাড়ি ফিরে আসতাম। এতোকিছুর মাঝে আমাদের পড়াশোনায় অবহেলা ছিল না। মনের আয়নায় শিক্ষকদের মুখ ভেসে উঠলে সন্ধ্যায় ঠিকই হারিকেনের আলোয় পড়া শিখতাম। ভাবতাম, শিক্ষকের সামনে সব পড়া না পারলে সেটা হবে ভীষণ লজ্জার। কখনো ভয়ে নয়, না পারার লজ্জায় পড়া শিখতাম। চারপাশের জগতের হাতছানির সঙ্গে পড়াশোনা এক হয়ে যেতো। এই চারপাশের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু ছিল স্কুল। স্কুলের পড়া-লেখার সঙ্গে চারপাশের জগৎ যখন এক হয়ে যেতো তখন স্কুলকে আঁকড়ে ধরতাম। মনে হতো স্কুল নামক এই জগৎটা আছে বলেই চারপাশের সবকিছুকে নতুন করে দেখতে শেখা হয়েছে।

স্কুল ছিল আমার জীবনে বন্ধুর মতো।

পাতার উৎসব

আমার স্কুলের চারদিকে ছিল খোলা মাঠ। না, ঠিক মাঠ বলা যাবে না। ফসলের মৌসুমে ওগুলোতে ধানের চারা লকলকিয়ে বেড়ে উঠতো। কি চমৎকার সবুজ হয়ে যেতো ধানগাছের মাথা। বদলে যেতো প্রকৃতির রঙ। এইসব দৃশ্যের ঠিক মাঝখানে ছিল স্কুলটি। চারদিকে বেড়া দিয়ে তৈরি করা ঘর। মাথার ওপরে

খড়ের চাল। মাঝখানে বেড়া দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ আলাদা করা হয়েছিল। এক ক্লাসের ছেলেমেয়েরা জোরে নামতা পড়লে বা কোনো পড়া মুখস্ত করতে থাকলে অন্য ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তা শুনতে পেতো।

স্কুলঘরের সামনে ছিল টানা বারান্দা। বেশ লম্বা বারান্দা। এ-মাথা ও-মাথা অনেকটা পথ। আসলে ঘরের আকার ছিল লম্বাটে। আর এই লম্বা ঘরটাকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ছোট ছোট করে ভাগ করা হয়েছিল। শেষ মাথায় ছিল হেডমাস্টার সাহেবের একটি অফিসঘর। এই ঘরে অন্য স্যাররাও বসতেন।

অফিসঘরে ছিল একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। একটি ছোট আলমারি। ঘরের দক্ষিণ দিকে ছিল একটি ছোট জানালা। সেই জানালায় কোনো পর্দা ছিল না। কোনো কারণে সেই ঘরে যেতে হলে আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে তাকালে দুটি চমৎকার ডালিম গাছ দেখতে পেতাম। লাল রঙের ডালিম ঝুলে থাকতো সে গাছে।

হেডমাস্টার সাহেব শখ করে গাছগুলো লাগিয়েছিলেন। ডালিম পাকলে সেগুলো ছিঁড়ে এনে ছেলেমেয়েদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে নিজের হাতে আমাদের দিতেন। হেডমাস্টার সাহেব বলতেন, তোদের ডালিম খাওয়াচ্ছি কেন বলতো? আমরা চুপ করে থাকতাম। আমাদের তো জানার কথা নয় যে কেন তিনি ডালিম খাওয়াচ্ছেন। আমরা একে অপরের মুখের দিকে

তাকাতাম। মাস্টার সাহেব ধমক দিয়ে বলতেন, এ ওর দিকে তাকাচ্ছিস কেন? আমার দিকে তাকা। আমরা ভয়ে ভয়ে স্যারের দিকে তাকাতাম। তিনি বলতেন, আমি চাই তোরা এই ডালিমের মতো সুন্দর হবি। স্বাস্থ্যে ঝলমল করে উঠবি। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে লেখাপড়া কাজে আসে না।

স্যারের কথা অনেকে বুঝতো না। অনেকে ডালিমের দানা মুখে পোরায় ব্যস্ত হয়ে যেতো। আমি তাকিয়ে দেখতাম স্যারের টকটকে গায়ের রঙ। মনে হতো স্যার বুঝি ডালিম খেতে খেতে বড় হয়েছেন। এর বাইরে অন্য কিছু ভাবার সাধ্য আমার ছিল না। আমরা ডালিম খেয়ে ক্লাসে ঢুকে যেতাম। ভুলে যেতাম স্যারের মূল্যবান কথা। তবে আমরা কেউ লুকিয়ে কিংবা দলবেঁধে কখনো পাকা কিংবা কাঁচা ডালিম ছিঁড়ি নি। অপেক্ষা করতাম কোনদিন স্যার আমাদের ডালিম খাওয়ানোর জন্য বারান্দায় লাইন করাবেন। আমরা পঁচিশ-ত্রিশজন ছেলেমেয়ের সেটা খুব সুখের দিন ছিল।

স্কুলের দক্ষিণ দিকে ছিল চলাচলের রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে বেশির ভাগ লোকই হেঁটে চলাচল করতো। কেউ সাইকেল চালাতো। কখনো গরুর গাড়ি চলতো। রিকসা কিংবা মোটর গাড়ি সে রাস্তায় চলাচল করতো না। স্কুলের হেড স্যার, অন্য স্যাররা, দপ্তরি এবং ছাত্রছাত্রীরা হেঁটে স্কুলে আসতো। রাস্তার ডান দিকে ছিল স্কুলের মাঠ। বাম দিকে গাঁয়ের বাড়িঘর। গেরস্ত বাড়ির মেয়েরা উঠোনে ধান শুকাতো। গরু-ছাগল বেঁধে রাখতো। হাঁস-মুরগি ঘুরে বেড়াতো। খুব ছোট ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা খেলা করতো। ওদের কোমরে কালো সুতো দিয়ে ঘুন্টি বাঁধা থাকতো। বাচ্চারা দৌড়ালে ঘুন্টি বাজতো টুং-টং করে। ওই শব্দ শুনতে আমাদের বেশ ভালো লাগতো। আমরা শব্দটা শোনার জন্য বাচ্চাটাকে খোঁচা দিয়ে দৌড়াতে বলতাম। বাচ্চাটি ভয়েই ছুটে পালাতো। আমরা হা-হা করে হাসতাম, যেন এমন মজা আর কিছুতেই হয় না। মাঝে মাঝে আমরা ওইসব বাড়িতে ঢুকে পানি খেতে চাইতাম। আমাদের কারো কোনো ফ্লাস্ক ছিল না। স্কুলের সামনে একটি টিউবওয়েল ছিল। কলের মুখে হাত লাগিয়ে পানি টেনে খেতে হতো। বেশির ভাগ সময় জামা ভিজে যেতো। মাঝে মাঝে বাড়ির মেয়েরা রেগে গিয়ে আমাদের বলতো, তোমরা এখানে কেন পানি খেতে আসো? তোমাদের স্কুলের কলে খেতে পারো না? আমি চটপট বলতাম, শুধু তো পানি চাই। আর তো কিছু চাই না। কলের পানি খেতে গেলে দুষ্টু ছেলেরা পানি ছিটোয়। জামা ভিজে যায়।

মেয়েটি মুখ ঝামটা দিয়ে বলতো, হয়েছে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। যত্তসব পাকামি। আমি রেগে বলতাম, একটু পানি খাওয়াবে তাতে এতো

কথা। আমাদের বাড়িতে গেলে তোমাকে কলসি কলসি পানি খেতে দেবো।

মেয়েটি রেগে বলতো, কি, এতো বড় কথা! পানি আনতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি। আমিও ছাড়তাম না। বলেই ফেলতাম, আমাদের স্কুলের টিউবওয়েল থেকেই তো পানি আনো। তোমাদের বাড়িতে তো কল নেই।

মেয়েটি চিৎকার করে মাকে ডাকতো। আর আমরা ছুট লাগাতাম। ভাবতাম, ওর মা বেরিয়ে হয়তো আমাদের মারতে পারে। এরপর কয়েকদিন না গিয়ে, আবার যেতাম। তখন মেয়েটির সঙ্গে ভাব হয়ে যেতো।

বলতাম, তুমি স্কুলে আসো না কেন?

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলতো, স্কুলে গিয়ে কী হবে?

আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলতো, আমাদের সঙ্গে মজা করতে পারবে।

মেয়েটি গ্লাস নিয়ে চলে যেতো। ওর মধ্যে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ দেখি নি। কেন? সেটা বোঝার বয়স আমার ছিল না।

আমাদের স্কুলের মাঠটি ছিল অনেক বড়। রাস্তা থেকে ওই মাঠ পার হয়ে স্কুলে ঢুকতে হতো। বর্ষায় ওই মাঠে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যেতো। ছেলেরা ওই জলে নেমে দুষ্টুমি করতো। আমরা, মেয়েরা কখনো নামতাম না। ওই মাঠে ছেলেদের কাবাডি প্রতিযোগিতা হতো অন্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বছরে একবার। সেদিন স্কুলে সাজ সাজ রব উঠতো। রঙিন কাগজের শেকল বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। কাগজের ফুল বানিয়ে বাঁশের বেড়ার গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হতো। মেয়েরা কাগজের এইসব আয়োজন নিয়ে মেতে উঠতাম। আমাদের খেলার কোনো সুযোগ হতো না। আমাদের খেলার কোনো প্রতিযোগিতা হতো না। আমরা মাঝে মাঝে ছি বুড়ি, কিংবা দাড়িয়াবান্ধা খেলতাম। তাও বেশিক্ষণ খেলার সুযোগ থাকতো না। তবে কাবাডি প্রতিযোগিতা আমাদের জন্যও খুব আনন্দের ছিল। কারণ সেটা শুধু ছেলেদের খেলা ছিল না। খেলাটা ছিল পুরো স্কুলের। অন্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে জেতাটা ছিল স্কুলের সম্মান। আমরা উদগ্রীব হয়ে খেলার মাঠের পাশে সারিবদ্ধ হয়ে বসে থাকতাম। আমাদের স্কুল জিতলে লাফালাফি করে হাততালি দিতাম। হারার লক্ষণ দেখলে চুপসে যেতাম। একবার আমাদের স্কুল জিতলে হেডস্যার বললেন, আমাদের ছেলেরা বিজয়ী হয়েছে। কালকে ওদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তোরা সবাই জলপাইয়ের পাতা দিয়ে মালা গাঁথবি। ওই মালা আমরা ওদের গলায় পরিয়ে দেবো।

আমি সাহস করে জিগ্যেস করলাম, জলপাইয়ের পাতা দিয়ে মালা বানাবো কেন স্যার?

হেডস্যার হেসে বললেন, অনেক অনেক দিন আগে গ্রিকদেশে বিজয়ী বীরদের জলপাইয়ের পাতার মুকুট দিয়ে সম্মান জানানো হতো। আমরা আর কি দিতে পারি ছেলেদের? আমরাও ওদের সম্মান জানাবো। সম্মানটাই হবে ওদের পুরস্কার। কাল স্কুল ছুটি। কিন্তু সবাই আসবি। তোদেরকে আমি খিচুড়ি আর গরুর মাংস খাওয়াবো।

হুররে!

আমাদের আনন্দের সীমা নেই। স্কুলের মাঠের কোণায় ছিল বিশাল জলপাই গাছ। আমরা সবাই সেই গাছের দিকে ছুট দিলাম। পেছন থেকে

অঙ্ক-স্যার আমাদের ডাকতে ডাকতে দৌড়ে এলেন। বললেন, তোরা আজ পাতা ছিঁড়িস না। আজ ছিঁড়লে শুকিয়ে যাবে। কাল স্কুলে এসে পাতা ছিঁড়ে মালা বানাবি। তাজা থাকবে।

আমরা অঙ্ক-স্যারের কথা শুনে ফিরে আসি। ভাবি, স্যার তো ঠিকই বলেছেন। মালা যদি তাজা না থাকে তাহলে সেটা যাকে দেওয়া হয়, তার গলায় ভালো দেখায় না। আমরা বাড়ি ফিরে আসি।

পরদিন সুঁই-সুতো দিয়ে মালা গাঁথার সময় অঙ্ক-স্যারকে জিগ্যেস করি, স্যার মুকুট বানাতে হয় কীভাবে?

সেটা অনেক কঠিন। তোরা পারবি না।

পারবো না কেন? এটাতো পাতার মুকুট স্যার।

এতো কথা বলিস না। তাড়াতাড়ি শেষ কর।

স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যাই। আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল আমাদের দলনেতার জন্য একটা মুকুট বানাতে। বানাতে গিয়ে না হয় খারাপই হবে, তাতে কি এসে যায়। মুকুটতো বলা যাবে! কিন্তু অঙ্ক-স্যারকে দ্বিতীয়বার কথাটি বলার আর সাহস হলো না।

একটু পরে খেলোয়াড়দের আলাদা করে বসানো হলো। ওদের ডেকে ডেকে হেডস্যার সবার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। আমরা হাততালি দিলাম। দেখলাম ওদের মুখগুলো কেমন লাজুক লাজুক হয়ে গেছে।

এবার আমরা বারান্দায় লম্বা সারি দিয়ে বসলাম। সবার সামনে কলাপাতা দেওয়া হয়েছে। একটু পর আমাদেরকে কলাপাতায় খেতে দেওয়া হবে। আমরা জানতাম পিকনিকে গেলে কলাপাতায় খাওয়া হয়। তখন পর্যন্ত আমি কোনো দলের সঙ্গে পিকনিকে যাই নি। তাই কলাপাতায় খিচুড়ি পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। দপ্তরি আমাদের জন্য কোন্ গাছ থেকে পাতা কেটে এনেছে আমরা জানি না। কলাপাতার মাঝখানের ডাঁটাটা কেটে ফেলে পাশের অংশগুলো টুকরো করে আমাদের সামনে দিয়েছে। কোনো কোনো পাতার অংশ খুব কচি। ওই দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি কেন রঙ বোঝাতে কখনো বলা হয় কচি কলাপাতার মতো সবুজ রঙ। মনে মনে ভাবি, সামনের ঈদে এমন একটি রঙের জামা চাইবো মায়ের কাছে। বলবো, কচি কলাপাতা আমার ভীষণ প্রিয় রঙ। অন্যদের বলি, দারুণ মজা। আজকে আমাদের পাতার উৎসব। একবার আমরা জলপাই পাতার মালা গেঁথেছি, এখন কলাপাতায় খিচুড়ি খাচ্ছি। মজা না? এমন দিন আমাদের পাওয়াই হয় না। চল বলি, হুররে, আজ আমাদের পাতার উৎসব। পাশের মেয়েটি বলে, চেঁচাস না। স্যার বকবে। বকবে কেন? আজ আমাদের আনন্দের দিন।

আহ্, চুপ কর।

ওর কথায় চুপ করেই যাই।

খাওয়া শেষে আমরা সবাই মাঠে নেমে আসি। খেলোয়াড় ছেলেরা বলে, আয় আমরা মাঠটাকে সালাম করি। এই মাঠটার জন্যই তো আমরা এমন মজার দিন পেয়েছি। অন্য স্কুলে এত বড় মাঠ নেই বলেই তো ওরা আমাদের এখানে খেলতে আসে।

এই কথা বলে ওরা হাত দিয়ে মাঠ ছুঁয়ে কপালে ঠেকায়।

আমি বলি, আমরাও সালাম করবো।

কেন, তোরা তো খেলিস নি।

আমি বললাম, খেলি নি তো কি হয়েছে? মাঠটা ছিল বলেই তো এখানে খেলা হয়েছে। আমরা খেলা দেখেছি। আনন্দ করেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক।

অন্যরা সায় দেয়। আমরা আবার মাঠটাকে সালাম করি। ছেলেরা হাততালি দেয়। একটা মাঠ যে আমাদের সবার কাছে এতো বড় হয়ে উঠবে আমরা কি তা কখনো ভাবতে পেরেছিলাম?

বাড়ি ফেরার পথে ভাবি, ভাগ্যিস এই মাঠটা ছিল, সেজন্য এমন সুন্দর একটা উৎসব আমাদের পাওনা হয়েছিল।

পাতার উৎসব, পাতার উৎসব, বলতে বলতে আমরা কয়েকজন বাড়িতে পৌঁছাই। শুধু দুঃখ একটা, পাতার মুকুট বানাতে পারলাম না।

আবদুল গনির ঘণ্টা

আমাদের স্কুলের দপ্তরির নাম ছিল আবদুল গনি। তিনি ঘণ্টা বাজাতেন। কখনো স্কুলে যেতে দেরি হলে আমরা দূর থেকে শুনতে পেতাম ঘণ্টার শব্দ। ঢং-ঢং-ঢং। ওই শব্দ শুনে আমরা দৌড় দিতাম। মাঠের ওপর দিয়ে সেই শব্দ আমাদের কাছে ভেসে আসতো। আমরা মাঠ পেরিয়ে ক্লাসে ঢুকলে ঘণ্টাধ্বনি থেমে যেতো।

আবদুল গনির অনেক বয়স হয়েছিল। পেতলের ভারি ঘণ্টাটা বাজানোর সময় তার হাতের রগ ফুলে উঠতো। বেশ কষ্ট করে বাজাতো। আমার মনে হতো এই বুঝি লোকটা পড়ে যাবে। আর পড়ে গেলে ঘণ্টাটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়বে। পড়ে গেলে মুখটা থেঁতলে যেতে পারে, কিংবা মাথা ফেটে যেতে পারে। কখনো আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কেন যে এমন ভাবনা হতো আজও ভেবে পাই না। আবদুল গনি স্কুলের সব কাজ করতেন। হেড স্যারের টেবিল-চেয়ার-আলমারি মোছা, মাঝে মাঝে স্কুল ঘরটা ঝাড়ু দেওয়া, ডালিম গাছটার যত্ন নেওয়া, ডালিম পাকলে সেটা পেড়ে আনা, এইসব কাজ।

একদিন স্কুল শুরুর আগে দেখলাম আবদুল গনি বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। জিগ্যেস করলাম, চাচা কি হয়েছে।

কপালে হাত দিয়ে বললেন, জ্বর।

জ্বর তো বাড়ি যান। আজকে ঘণ্টা বাজাতে হবে না।

তা কি হয়। তাহলে ঘন্টা বাজাবে কে?

কেউ বাজাবে না।

স্যাররা কী করে বুঝবে যে ক্লাস শেষ হলো?

স্যাররা ঘড়ি দেখে বুঝে নেবেন।

হা-হা করে হেসে আবদুল গনি বলেন, এমন করে ক্লাস চললে তো আমার চাকরি থাকবে না।

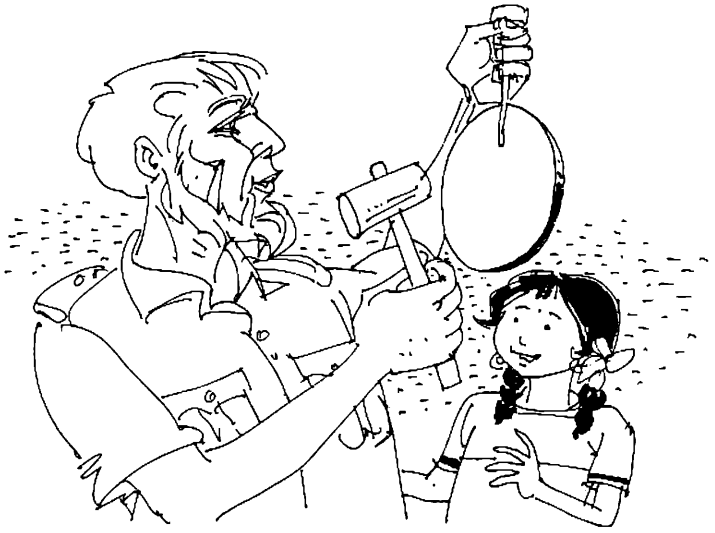

দরকার নেই চাকরি করার। আপনি বাড়ি যান।

চাকরি না করলে খাবো কি?

আমরা চুপ করে থাকি।

আবদুল গনি আমাদের বলেন, আটটা ছেলেমেয়ে আমার। ওদেরকে কে দেখবে? ওরা যে না খেয়ে মরে যাবে।

না, না এটাতো হয় না। আপনার চাকরি করাই উচিত। আমরা সমবেত কণ্ঠে বলি। আবদুল গনি হাসতে থাকেন। আমরা ক্লাসে যাই। তার একটুপর শুনি ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজছে। আমাদের অঙ্ক ক্লাস শেষ, এখন বাংলা-স্যার আসবেন। গনি চাচাই আমাদের মনে করিয়ে দেন যে একটা ক্লাস শেষ হয়েছে, এবার তোমাদের অন্য কিছু শিখতে হবে। বেশ মজা। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এমন

ঘণ্টার ব্যবস্থা না থাকলে কি আমরা সব সময়ে এক ক্লাসেই বসে থাকতাম? কে জানে। ঠোঁট উল্টিয়ে, হাত উল্টিয়ে নিজেকেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেই।

সেবার ছিল আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার সময়। দু'দিন পর শুরু হবে। সব ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার চিন্তায় তটস্থ। সবাই বেশ মনোযোগী হয়ে উঠেছে। একদিন দুপুর বেলা গনি চাচা ঘণ্টা বাজানোর সময় উল্টে পড়ে গেলেন। স্যাররা ছুটে গেলেন তাঁকে তুলতে। দেখা গেল তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। কোনো একজন স্যার পানি আনলেন। চোখেমুখে পানির ছিটা দিলেন। গনি চাচা তাকালেন না। হেড স্যার যে মাদুরে নামাজ পড়তেন সেটা বিছিয়ে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হলো। একজন স্যার গেলেন ডাক্তার আনতে। কোনো একজন স্যার ঘণ্টাটা উঠিয়ে নিয়ে হেডস্যারের রুমে রাখলেন। অনেক শুশ্রূষা করা হলো। ডাক্তার এলো। কিন্তু গনি চাচার জ্ঞান ফিরলো না। তাঁর বুকের হাঁড়গুলো ওঠানামা করছে। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছি। শেষে একজন স্যার বললেন, এই তোদের ছুটি, তোরা চলে যা। কেউ এখানে থাকবে না।

আমরা সব ছেলেমেয়েরা এই প্রথম কোনো হইচই না করে স্কুলের মাঠ ছাড়িয়ে চলে এলাম। গনি চাচার জন্য আমাদের খুব খারাপ লাগছিল। একবার বুকের ভেতর আতঙ্ক নিয়ে ভাবলাম, মানুষটা কি না-খেতে পেয়ে মরে গেল? এখন তার ছেলেমেয়েদের কে দেখবে? আবার ভাবলাম, দূর ছাই মরবে কেন। গনি চাচার অসুখ করেছে।

পরদিন আমাদের স্কুল শুরু হলো ঘণ্টা বাজানো ছাড়া। স্যাররা আমাদের ক্লাসে ঢুকিয়ে পড়ানো শুরু করে দিলেন। আবার ঘড়ি দেখে ক্লাস শেষ করলেন। খানিকক্ষণ পর খবর এলো যে গনি চাচা মারা গেছেন। তাঁর বাড়ি ছিল আমাদের স্কুলের কাছেই। আমরা সবাই গেলাম সেই বাড়িতে।

তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজনের কান্না দেখে আমারও ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। আমি কাঁদতে শুরু করি। ক্লাসের একজন ছেলে আমাকে বলে, তুই কাঁদছিস কেন?

আমার যে খুব খারাপ লাগছে। তাই কান্না পাচ্ছে।

গনি চাচাতো তোর কেউ হয় না।

না হলে কি দুঃখ হয় না?

ঢঙ। তাও যদি নিজের চাচা হতো।

ও আমাকে ভেংচি কাটে। ওর কথায় আমার আরও কান্না পায়। আমি চোখের জল মুছে শেষ করতে পারি না। চুপিচুপি সবার সামনে থেকে সরে

দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। একসময় সবার সঙ্গে স্কুলে ফিরে আসি।

পুষ্প বলে, ইস, তোর চোখ একদম ফুলে গেছে।

আর একজন বলে, লালও হয়ে গেছে।

তুই এতো কেঁদেছিস কেন রে?

আমি চুপ করে থাকি। আমি কি উত্তর দেবো বুঝতে পারি না। কেন কেঁদেছি এর কোনো জবাবও আমার কাছে ছিল না।

বাংলা ক্লাস শেষ হলে আমি স্যারের পিছু পিছু যাই। স্যার আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলেন, কি রে কিছু বলবি?

স্যার।

বল, কি বলবি।

অন্য কেউ মারা গেলে কি কাঁদতে হয় না?

কে বলেছে হয় না? হয়। দুঃখ পেলে তো কাঁদতে হয়।

তোকে কেউ কিছু বলেছে?

হ্যাঁ। আমি গনি চাচার জন্য কেঁদেছি। সেজন্য নজরুল বলেছে তুই কাঁদছিস কেন? গনি চাচা তো তোর কেউ হয় না।

ও একটা বোকা। ও কিছু জানে না। তুই ঠিক করেছিস। দুঃখ পেলে কাঁদতে হয়। অন্যের কষ্ট দেখলে কাঁদতে হয়। মানুষইতো মানুষের জন্য কাঁদবে। ওই যে গরুটা, ওটা কি তোদের গনি চাচার জন্য কাঁদবে? গনি চাচা কি ওটার জন্য ঘণ্টা বাজাতো? না কি তোদের জন্য বাজাতো?

আমাদের জন্য।

ঠিক বলেছিস। যা এখন ক্লাসে যা।

আমি ভীষণ আনন্দ নিয়ে ক্লাসে ফিরে আসি। আমি যে কোনো ভুল করি নি এটা আমাকে খুব স্বস্তি দেয়। আমার ইচ্ছে হয়েছিল স্যারের পা ধরে সালাম করতে। স্যার আমাকে এভাবে ক্লাসে যেতে না বললে আমি ঠিকই সালাম করতাম।

কয়েক দিন ঘণ্টা বাজানো নিয়ে বেশ অসুবিধা হয়। তারপর স্যাররা ঠিক করেন যে তারাই ঘণ্টা বাজাবেন। একেক সময় এক একজন স্যার ঘণ্টা বাজাতেন।

তার কিছুদিন পর একজন নতুন দপ্তরি আসে আমাদের স্কুলে। সে গনি চাচার মতো বুড়ো ছিল না। স্বাস্থ্য ভালো ছিল। কালো, মোটা দেখতে। ওর নামটা কি ছিল আজ আর মনে নাই। ও যখন ঘণ্টা বাজাতো মনে হতো ঘণ্টাটা অন্যরকম করে বাজাচ্ছে। ওটা গনি চাচার ঘণ্টাধ্বনির মতো ঢং ঢং করছে না।

ওই ঘণ্টাধ্বনি শুনলে আমার মন খারাপ হয়ে যেতো। কোনো কোনো দিন ক্লাস শেষে বাইরে এসে দাঁড়ালে দেখতাম প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে স্কুলের মাঠ। বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের বারান্দা। স্কুল ছুটি হলে দেখা যাবে বারান্দাটা কাদা-কাদা হয়ে গেছে। আমরা পায়ের পাতায় কাদা নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। মনে হতো ঘণ্টাটা বেজে যাচ্ছে ঢং-ঢং। একজন নতুন দপ্তরি নতুন সুর তুলেছে ওই ঘণ্টায়। বই স্লেট বুকে জড়িয়ে আমরা ছুটতাম। পুলিশ লাইন পেরিয়ে, হানিফের দোকান ছাড়িয়ে পাকা সড়ক ধরে চলে আসতাম বাড়িতে। বাবার কাছে, মায়ের কাছে, ভাইবোনদের কাছে।

ওদের সঙ্গে ভাব

আমাদের কোনো খাতা ছিল না। আমরা স্লেটে লিখতাম। ক্লাসে অঙ্ক করা হয়ে গেলে সেটা মুছে আবার বাংলা লিখতাম, কিংবা ইংরেজি। এভাবে চলতো লেখাপড়া। ক্লাস ফাইভে উঠেছি। এটাই আমার প্রাইমারি স্কুলের শেষ বছর। বাবা বলেছেন, ভালো রেজাল্ট করলে বগুড়া ভি. এম. স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। সে সময়ে ভি. এম. ছিল বিখ্যাত স্কুল। বড় স্কুলে পড়বো, প্রতিদিন শহরে যাবো এই আনন্দ আমাকে মাতিয়ে রাখে। পড়ালেখায় মনোযোগী হয়ে উঠি। অঙ্কটা কম বুঝতাম, কিন্তু অন্য বিষয়গুলো ভালোই পারতাম। ইংরেজি, বাংলা বানান একদম ভুল হতো না। মাঝে-মাঝে স্যাররা আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতেন এবং সেগুলোকে একে অন্যেরটা পরীক্ষা করতে দিতেন। আমরা সেগুলো ভুল হলো না কি হলো তা চিহ্নিত করতাম। একবার স্যার অনেকগুলো বানান লিখতে দিলেন। তারপর একজনের স্লেট আর একজনকে দিয়ে বললেন, তোমরা একে অপরেরটা শুদ্ধ করো।

আমার কাছে যার স্লেট পড়েছে, আমি তার স্লেটে বানান ঠিক হলে টিক মার্ক দিলাম, ভুল হলে ক্রস চিহ্ন। আমার স্লেট যে ছেলেটির হাতে পড়লো সে আমার বেশ কয়েকটি বানান হিজিবিজি করে কাটলো। বোঝাই যাচ্ছিল না যে কি লেখা ছিল। এদিকে মনে মনে আমার খুব বিশ্বাস ছিল যে আমার কোনো বানান ভুল হবে না। ছেলেটি আমার স্লেট স্যারকে দেখিয়ে বললো, ও অনেক বানান ভুল করেছে স্যার।

কৈ দেখি।

ওর হাত থেকে স্লেট টেনে নিয়ে স্লেটের মধ্যে হিজিবিজি দেখে তো রাগে-দুঃখে আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম, স্যার, ও আমার যেসব বানান কেটেছে সেগুলো আমি আপনার সামনে লিখতে চাই।

স্যার বললেন, কাঁদিস না। আমার সামনে দাঁড়িয়ে লেখ। যদি তুই শুদ্ধ করে লিখতে পারিস তাহলে ও শাস্তি পাবে।

ছেলেটির দিকে তাকাই। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আমি স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখে ফেলি।

স্যার আমার স্লেট দেখে দাঁত কিড়মিড় করে ওকে কড়া ধমক দিয়ে বললেন, কিরে, ওর শুদ্ধ বানানগুলো তুই এমন হিজিবিজি করে কেটেছিস কেন?

ছেলেটি কথা বলতে পারে না। ভয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যার বেত উঠিয়ে ওকে দু' ঘা লাগিয়ে বললেন, আমার টেবিলের পাশে নিলডাউন হয়ে থাক।

ছেলেটি নিলডাউন হয়ে থাকে। একটু পর দেখি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ও আমাকে বলেছিল গনি চাচার জন্য কাঁদছি কেন। এখন ওকে কাঁদতে দেখে আমার একটুও মায়া হলো না। বারবার মনে হলো ও একটা ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। ও ফাঁকি দিয়ে আমাকে ছোট বানাতে চেয়েছিল। নিজে সবগুলো বানান অশুদ্ধ লিখে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পেরে খারাপ পথটা বেছে নিয়েছিল।

পরদিন ওর বন্ধু আমাকে বললো, তুই ওর বিরুদ্ধে নালিশ দিলি কেন?

নালিশ তো দেই নি। স্যারকে বলেছি—

ওই একই কথা হলো। ওটাই নালিশ।

তুই তোর বন্ধুকে বকতে পারলি না।

কেন বকবো?

বাহ্, ওতো একটা খারাপ কাজ করেছে। ভীষণ খারাপ। ফাঁকি দিয়ে বাহাদুরি নিতে চেয়েছিল। সোজা পথে নিতে পারলো না?

তুই ছেলে হলে আমি ঘুঁষি মেরে তোর নাক উড়িয়ে দিতাম।

ইস, অতো সোজা না। তোর সাহস নেই বলে তুই এখন আমাকে মেয়ে হওয়ার দোহাই দিচ্ছিস। খবরদার বলছি আমার সঙ্গে লাগতে আসবি না।

পাশ থেকে অন্য আর একজন বললো, দেখতে পুঁচকে হলে কি হবে, সাহস আছে।

পুষ্প আমার হাত ধরে টেনে বলে, ওদের সঙ্গে আর কথা বলিস না। চল, যত্তসব পাজি ছেলে।

এরপর ওদের সঙ্গে আমি আর পুষ্প কথা বলতাম না।

সেই বয়সেই ওই কাজটিকে আমার খুব অনৈতিক মনে হয়েছিল। বন্ধুরা ওই কাজটিকে দুষ্টামি বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল দেখে সেটা আমার আরও খারাপ লেগেছিল। একটি খারাপ কাজের জন্য ওরা বন্ধুকে কিছু বললো না, আর আমি সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম বলে সেটা আমার অপরাধ হলো।

বেশ অনেকদিন আমি ওদের সঙ্গে কথা বলি নি দেখে ওরা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, পুঁচকেটার জেদ আছে।

লম্বায় খাটো ছিলাম বলে ওরা আমাকে পুঁচকে বলতো, সামনাসামনি নয়, পেছন থেকে। সেটা আমি গায়ে মাখতাম না। একদিন রুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, সাহস থাকে তো সামনে এসে বল।

ওরা ও-বাবা বলে দৌড়ে পালিয়েছিল।

একদিন নিজেরাই এসে বললো, তুই কি আমাদের সঙ্গে কথা বলবি না?

বাঁদরের সঙ্গে আমি কথা বলি না।

তুই আমাদের বাঁদর বললি?

পুষ্প সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, ঠিকই বলেছে। তোরা তো বাঁদরই।

স্যারের কাছে নালিশ দেবো।

ওই সাহস তোদের নেই। উলটো বেত খাবি।

ওরা চুপ হয়ে যায়। জানে স্যারের কাছে যাওয়ার সাহস ওদের নেই। তারপর নিজেরাই একদিন মাফ চেয়ে বলে, আর কখনো এমন করবো না।

আমি বলেছিলাম, মনে থাকবে তো!

থাকবে।

ওদের নমনীয় আচরণে আমার দুঃখ দূর হয়ে আবার ভাব হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে সবাই মিলে দাড়িয়াবান্দা খেললাম।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে

সেরিকালচার নার্সারির সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ছিল। স্কুলে যাওয়ার রাস্তার দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য আমরা নার্সারির শেষ সীমানার কাঁটাতার ডিঙিয়ে বড় সড়কে উঠতাম। সীমানার এই কোণায় একটি বড় খেজুর গাছ ছিল। আমাদের স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে এক কাঁদি খেজুর সবুজ থেকে কমলা হয়ে যেতো। আমরা গাছের নিচ থেকে পাকা খেজুর কুড়িয়ে নিতাম। মাঝে মাঝে বিচি সংগ্রহ করতাম। সেই বিচি দিয়ে খেলতাম।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে দেখি খেজুর গাছের নিচে লোকেরা ভিড় জমিয়েছে। সবাই উত্তেজিত। আমরা কাছে আসতেই লোকেরা আমাদের হাত টেনে ধরে বললো, খবরদার গাছের নিচ দিয়ে যাবে না।

কেন? কি হয়েছে?

খেজুরের পাতায় যে তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে সে ব্যাপারে আমরা খুব সচেতন। সবসময় কাঁটা এড়িয়ে চলি। আমাদের হাতে-পায়ে কখনো কাঁটা ফোটে নি। আব্বার অফিসের একজন পিয়ন ওখানে দাঁড়িয়েছিল। তাকে জিগ্যেস করলাম, আজম ভাই কি হয়েছে?

সাপ, গাছের মাথায় সাপ।

সাপ? আমরা চেঁচিয়ে উঠি।

সবাই বলি, আমরা সাপ দেখবো।

তোমাদের স্কুলে দেরি হয়ে যাবে। চলে যাও।

না, আমরা আজ স্কুলে যাবো না।

আমরা সবাই পেছনে সরে তুঁত গাছের নিচে দাঁড়াই। খেজুর গাছের মাথায় সাপ দেখার চেষ্টা করি। আজম ভাইকে জিগ্যেস করি, কি সাপ আজম ভাই?

অজগর।

অজগর? ও মাগো। আমরা অজগর সাপ দেখবো। স্কুলের বইতে পড়েছি,

অ-তে অজগর। অজগরটি আসছে তেড়ে। এ্যাই তোরা শুনেছিস না, অজগরের মুখ এতোবড় যে একটি গোটা হরিণ গিলে খায়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা অজগরের অনেক গল্প শুনেছি। পৃথিবীতে যতো সাপ আছে অজগরই সব চাইতে বড়।

ইস! আজ আমরা অজগর দেখতে পাবো।

কিন্তু ওটাতো গাছের মাথায় —

তাইতো, ওটা কেমন পেঁচিয়ে গোল হয়ে আছে।

কখন নামবে?

জানি না।

এতোলোক থাকলে ওটা নামবেই না।

তাহলে আমাদের পুরো সাপটা দেখা হবে না।

ওটা খেজুর গাছের মাথায় উঠলো কি করে!

জানি না।

ওটার কি কাঁটার ভয় নেই?

নেই। ভয় থাকলে কি উঠতো?

ওটা কখন নামবে রে?

লোকজন চলে গেলে বোধহয়।

রাতেও নামতে পারে।

গভীর রাতে নামবে।

আমরা তখন দেখতে পারবো না।

আমরা চুপিচুপি রাতে উঠে এখানে এসে বসে থাকবো।

ওটা যদি আমাদের গিলে খায়।

ও বাবা —

আমরা সবাই জড়সড় হয়ে বসি। আস্তে আস্তে গাছের নিচে ভিড় বাড়তে থাকে। আমরা গাছের উপরের দিকে তাকিয়ে থাকি। সাপটা যেভাবে ছিল

সেভাবেই আছে। যেন ঘুমিয়ে গেছে। ওর ঘুম কেউ ভাঙাতে পারবে না। কিংবা ও কোনো কিছুর তোয়াক্কা করছে না। গাছের নিচে এতো লোকের ভিড় জমতে দেখে ও তোয়াক্কাই করছে না। যেন সব লোককে একসঙ্গে পেঁচিয়ে ধরে ও মেরে ফেলতে পারে।

সাপ দেখার উত্তেজনা আমাদের পেয়ে বসে। আমরা স্কুলের কথা ভুলে যাই। বড় তুঁতগাছটার নিচে আমাদের বই-স্লেট রেখে আমরা সাপ দেখতে থাকি। ভাবি, ও এতো নিশ্চুপ কেন? কেন মানুষ দেখে নড়ছে না? ও নিচে নেমে এলে ভয়ে সব মানুষ এখান থেকে পালাবে। আমাদের পাঁচজন থেকে কেউ একজন বলে, ওটাকে মেরে ফেলা উচিত।

হ্যাঁ, মেরে ফেলা উচিত।

না মারলে ওটা আমাদের ছেলেমেয়েদের গিলে খেয়ে ফেলবে।

স্যারের তো বন্দুক আছে। স্যার ওটাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে।

স্যারকে ডাকতে গেছে ওসমান। স্যার একটু পর এসে পড়বে।

আব্বা ওটাকে বন্দুক দিয়ে মারবে শুনে আমার খুব খারাপ লাগে। কোনোভাবে সাপটাকে চলে যেতে দিলেই তো হয়? ও আর কখনো এই এলাকায় আসবে না। গভীর জঙ্গলে চলে যাবে। আমি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলি, তোরা কি বলিস রে ওটাকে চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়?

হ্যাঁ, উচিত। আমরা ওটাকে বন্দুক দিয়ে মারতে দেবো না।

ঠিক, ঠিক।

ছোটরা কলরব করে। কিন্তু বড়রা ছোটদের কথা শোনে না। শুনতে পায় না।

একটু পরে আব্বা তার দোনালা বন্দুক নিয়ে খেজুরতলায় আসেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে বলি, আব্বা সাপটাকে মারবেন না?

আব্বা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, স্কুলে যাস নি কেন?

স্কুলে গেলে তো সাপটা দেখতে পারতাম না।

আব্বা আমাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান। হাতের তালুতে রোদ আড়াল করে গাছের মাথায় সাপ দেখেন। বলেন, এতোবড় সাপ আমি আগে কখনো দেখি নি।

আব্বা সাপটাকে মারবেন না। আমি আবার অনুনয় করি।

আব্বা আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, ওটাকে না মারলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। এতোবড় সাপকে লাঠি দিয়ে মারা যাবে না। ওটা অনেককে কামড়াতে পারে।

রাত হলে ও গাছ থেকে নেমে চলে যাবে আব্বা।

আব্বা চিন্তিত হয়ে বলেন, রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। ওটাকে আমাদের মেরে ফেলাই উচিত।

আমি আর কথা বাড়াই না। চুপ করে থাকি। একটু পর গাছের নিচ থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আব্বা সাপটাকে গুলি করেন।

সাপটা রক্তাক্ত বিশাল শরীর নিয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়। আব্বা আবার গুলি করেন। পড়ে যাওয়ার পর যেটুকু নড়াচড়া করছিল সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।

এক পা দু' পা করে সবাই কাছে এগিয়ে দেখে। আমি এগোই না। তুঁত গাছের নিচে বসে থাকি। সবাই সাপটাকে ঘিরে দাঁড়ালে আমি বই-স্লেট নিয়ে বাড়িতে চলে আসি।

পরদিন বাংলা ক্লাসে স্যার জিগ্যেস করেন, কিরে কাল স্কুলে আসিস নি কেন?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। স্যার আবার বলেন, কি হয়েছিল?

আমার আব্বা একটা সাপকে গুলি করে মেরেছে। সাপটাকে মেরে ফেলা কি ঠিক হয়েছে স্যার?

স্যার অল্পক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর জিগ্যেস করেন, তোর কি খারাপ লেগেছে?

আমি ঘাড় কাত করে বলি, হ্যাঁ।

কিন্তু তুই বল, সাপতো বিষাক্ত প্রাণী। মানুষকে কামড়ালে মানুষ মরে যায়।

তাই বলে মেরে ফেলা কি উচিত? ওটাকে জঙ্গলে চলে যেতে দেওয়া যেতো?

বিপদটা আগে বুঝতে হবে? ওটা যদি জঙ্গলে না গিয়ে তোদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকতো, তখন কি হতো?

আমি চুপ করে থাকি। তাই তো তখন কি হতো? সাপটা আমাদের সবাইকে খেয়ে ফেলতে পারতো! কিন্তু তারপরও...

বস। পড়ায় মন দে।

স্যারের নির্দেশে আমি বসে পড়ি ঠিকই, কিন্তু আমার দ্বিধা কাটে না। এই প্রথম আমি আমার স্কুলের কাছ থেকে প্রশ্নের যে উত্তর পাই তা আমার মনঃপুত হয় না। বিষয়টি আমাকে ভাবাতেই থাকে।

হেডস্যার : একজন শান্তাক্লজ

সবার শেষে হেড স্যারের কথা। মনে হয় এটা তো শুরুতে বলা উচিত ছিল। পরে ভাবলাম, না স্যারের কথা দিয়েই শেষ করতে হবে। কারণ তাঁর কথার পরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।

তিনি ছিলেন ঋষি পুরুষ। মুখে লম্বা সাদা দাড়ি, মাথা ভর্তি সাদা চুল। টকটকে গায়ের রঙ। হালকা-পাতলা শরীর। মাঝারি আকারের লম্বা। তিনি দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েছিলেন। ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতেন। একটি পা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা কখনো খোঁড়া ভাবতে পারতাম না।

আমার সেই বয়সে আমার সামনে শান্তাক্লজের ধারণা ছিল না। এখন এই লেখা লেখার সময় মনে হচ্ছে তাঁকে আমি শান্তাক্লজের সঙ্গে তুলনা করতে পারতাম। যেন সেই রকমই চেহারা। তাঁর হাতে ধরা ঝুলির মধ্যে আমাদের জন্য থাকতো উপহার। তিনি আমাদের জ্ঞান উপহার দিতেন। অন্য স্যাররা এক একজন এক একটি ক্লাস নিতেন। আর তিনি পুরো স্কুলকে জড়ো করে একসঙ্গে পাঠ দিতেন।

তিনি আমাদের স্কুলের মাঠে সারি করে দাঁড় করিয়ে সামনে এসে বলতেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।' আমরা চেঁচিয়ে লাইনটি বলতাম। স্কুল মুখরিত হয়ে উঠতো আমাদের কলকণ্ঠে। মনে আছে তিনি বলতেন, 'তোরা হলি পাখি। তোদের জীবন থেকে অন্ধকার দূর হয়ে যাক। তোরা অন্ধকারের বিরুদ্ধে কলরব করবি।'

প্রতিদিন এই একটি লাইন তিনি আমাদের উচ্চারণ করাতেন। আমরা চিৎকার করে বলতে আনন্দ পেতাম। আমি জানি আমরা তখন কেউই এর গভীর অর্থ বুঝতাম না। এখন মনে হয় স্যার যখন আমাদের লাইনটা উচ্চারণ করাতেন তখন বোধহয় স্কুলঘরটার কোনো বেড়া থাকতো না। চারদিক খোলাসা হয়ে যেতো। আর চারপাশ থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে বাজতো 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'। সেদিন এই সব পঙ্‌ক্তির ভেতরের অর্থ বুঝি নি। আজ মনে হয় সত্যি কি আমাদের জীবন থেকে অন্ধকার দূর হয়েছে? সত্যি কি ছেলেমেয়েরা ফুটে ওঠার সুযোগ পায়? আমি এখন জানি, পায় না। আমি এখন জানি, আমাদের জীবনের চারপাশ থেকে অন্ধকার দূর হয় নি। আর আমি স্মরণ করি তাঁকে, যিনি একটি পা সম্বল করে আমাদের জীবন থেকে অন্ধকার তাড়াতে চেয়েছিলেন।

ক্লাস ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। যেদিন রেজাল্ট দেবে সেদিনই ছিল ওই স্কুলে আমার শেষ দিন। আমি শহরের বড় স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলাম। ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। ক'জনই বা ছেলেমেয়ে, তার আবার ফার্স্ট-সেকেন্ড। খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভার হয়ে গিয়েছিল। রেজাল্টের খবর শোনার পর স্কুলে আর আসতে হবে না ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে তাকাই। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে বাতাস ছুটে আসছে হু-হু করে। সে বাতাস চোখের জল আরও বাড়িয়ে দেয়, যেন বয়ে নিয়ে আসছে জলীয় বাষ্প। দু'হাতে চোখ মুছি।

বিদায়ের সময় হেড স্যারের পা ধরে সালাম করলে তিনি মাথায় হাত রেখে বললেন, দুটো পা ছুঁয়ে তো সালাম করতে পারলি না। মনে রাখিস এই ল্যাংড়া হেডমাস্টারকে। দোয়া করি বড় হ।

বোকার মতো তাকিয়ে থাকি। কিছু বলতে পারি না। বিদায়ের আবেগে তখন কেবলই চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। হেডস্যার হাসতে হাসতে আরও বলেন, একটা পা নেই বলে আমার কোনো দুঃখ নেই। অ্যাকসিডেন্টে পা হারিয়ে এই স্কুলে ঢুকেছিলাম। কতো ছেলেমেয়ের পা তৈরি করে দিয়েছি। বলেছি, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে শিখতে হবে। আমার পা নেই তো কি

হয়েছে রে, তোদের তো আছে। আজকে তো আমার সেই দিন। প্রতি বছর এই দিনে আমি সব ছেলেমেয়েদের বলি, এক দৌড়ে স্কুলের মাঠটা পার হয়ে যেতে। আমি দাঁড়িয়ে তোদের দৌড়ে যাওয়া দেখি। যা তোরা রেডি হ।

হেডস্যার অন্য স্যারদের বললেন, সব ছেলেমেয়েকে এক জায়গায় জড়ো করতে। রেজাল্ট পাওয়ার পরপরই অনেকে মাঠের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। আমরা দু'তিনজন যাই নি। স্যারের কাছ থেকে বিদায় নেবো বলে কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। এক ফাঁকে পুষ্প বলে, তোর সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে না রে?

কেন হবে না। তুই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবি।

পুষ্প ম্লান মুখে বলে, বেড়াতে যাওয়া হবে না। আমাকে তো বাড়ি থেকেই বের হতে দেবে না। মা বলেছে আমি নাকি বড় হয়ে গেছি। আমার আর পড়তে হবে না। আমাকে শহরের স্কুলে ভর্তি করাবে না।

বলিস কি? তুই আর পড়বি না?

পুষ্প মুখ নিচু করে। আমি দেখতে পাই ও চোখের জল আড়াল করতে চাইছে।

পুষ্প! কাঁদছিস?

চুপ। বলিস না।

সত্যি তোর আর পড়া হবে না?

না।

তাহলে কি করবি?

বাড়িতে বসে থাকবো। মা বলেছে ছেলে খুঁজবে। ভালো ছেলে পেলে বিয়ে দিয়ে দেবে।

ওর কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় করে। আমি ওর হাত চেপে ধরি। ওকে আর একটি কথাও বলতে পারি না।

তখন স্যাররা অন্য ছেলেমেয়েদের মাঠের মাঝখানে এনে জড়ো করেছেন। আমি পুষ্পর হাত ধরে মধ্যমাঠে দৌড়ে যাই। যেতে যেতে পুষ্পকে বলি, কাঁদিস না পুষ্প। তুই আমার বাসায় আসতে না পারলে কি হবে, আমি ঠিকই তোর বাসায় যাবো। তোকে দেখে আসবো। অনেক গল্প করবো।

আমরা এক জায়গায় জড়ো হলে হেডস্যার আমাদের বললেন, এবার তোরা দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে যা। আমি তোদের দৌড়ে যাওয়া দেখবো।

আমরা ছুট দিলাম। মাঠ পেরিয়ে পুলিশ লাইনের ভেতরে ঢোকার মুখে

থমকে দাঁড়ালাম। আর দৌড়াতে পারছি না। পেছন ফিরে তাকালাম। হেড স্যার তখনো দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর সাদা চুল-দাড়ি বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তাঁর একটি পা নেই, তিনি ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার

সঙ্গে আর হয়তো তাঁর দেখা হবে না। অন্য ছেলেমেয়েরা এগিয়ে গেছে। আমিও হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম, স্যারের সঙ্গে দেখা হবে না ভাবছি কেন? নিশ্চয় একদিন ফিরে আসবো এই স্কুলে স্যারকে আবার সালাম করতে।

এখনও অন্ধকার

প্রায় বেয়াল্লিশ কিংবা তারও কিছু বেশি সময় পরে ১৯৯৯ সালে আমি আমার শিক্ষা জীবনের প্রথম স্কুলটি দেখতে গিয়েছিলাম।

বগুড়া শহরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার প্রিয় করতোয়া নদী শীর্ণ হয়ে গেছে। যে জল অবশিষ্ট আছে তা পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। আমরা যেখানে থাকতাম সে গ্রাম শহর হয়ে গেছে। বিশাল বিলে ধান চাষ হচ্ছে।

আর আমার স্কুলটির বেড়ার ঘর নেই। সেটা একটি পাকা দালান হয়েছে। মাঠটি আর অতবড় নেই। পুলিশ লাইন সম্প্রসারিত হয়ে স্কুলের কাছে চলে এসেছে। পাকা দালানের বারান্দার এখানে-ওখানে গোবর ছড়িয়ে আছে। মাঠে গরু-ছাগলের ভিড়। স্কুলঘরের দরজা বন্ধ। আমি ছোট দালানের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম, আর বিড়বিড় করে বলছিলাম, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'। আমার সামনে হেডস্যার নেই। তিনি অনেক আগে মারা গেছেন। বাবা বগুড়া থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার কারণে স্যারের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। শুধু মাথায় পুঁতে দেওয়া তাঁর বীজমন্ত্রটি আমার ভেতরে বড় হতে থাকে। আমি ভুলি না যে, এই স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের সবার মধ্য থেকে অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন।

২-১১-২০০১

●●●

'আমার স্কুল' সিরিজে আরো লিখেছেন
ফয়েজ আহ্‌মদ • সৈয়দ শামসুল হক
রামেন্দু মজুমদার • আনোয়ারা সৈয়দ হক
রশীদ হায়দার • ভবতোষ দত্ত

শহরতলির ছোট্ট এক স্কুল, গুটিকয়েক শিক্ষক আর বেশকিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে মিশে আছে সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে। সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীর জীবনে কতো বড় ছাপ রেখে যায়, জীবনের চলার পথে কীভাবে শক্তির উৎস হয়ে ওঠে, টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় সেই জীবনসত্যের কথা বলেছেন সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। 'আমার স্কুল' পর্যায়ে আরো অনেকে বলবেন তাঁদের ফেলে-আসা স্কুলজীবনের কথা, যে-বই নবীন পাঠক-পাঠিকাদের ভালোবাসতে শেখাবে তাদের বিদ্যাপীঠ, শ্রদ্ধানত করে তুলবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি এবং স্কুলজীবনের বিচিত্র আনন্দের শরিক করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে বন্ধন করবে নিবিড়। ছোট্ট এই বই তাই বলছে অনেক বড় অভিজ্ঞতার কথা, স্কুলের যেসব অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হতে হতে বড় হওয়ার পথে পা বাড়ায় ছাত্রছাত্রীরা।

সাহিত্য প্রকাশ
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা ১০০০

IS BN 984 465 297-9
9 789844 652972

সেকায়েপ
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠ্যভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়